এই সময়

ক থা স রি ৎ

কেউ বা ভোলে পদের মায়ায়/ কেউ বা ভোলে রাজক্ষমতায়।/
এই কথাটি জেনো খাঁটি/ বেড়াল খোঁজে নরম মাটি।
— অন্নদাশঙ্কর রায়

অহেতুক

কেন্দ্রীয় সরকারকে ১ লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি টাকা দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, তা নিয়ে বিশেষত কংগ্রেস যে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে তা সম্পূর্ণ অহেতুক। খুব স্পষ্ট ভাবে এ সত্যটি বোঝা প্রয়োজন যে এই অর্থ কেন্দ্রকে দেওয়া হচ্ছে উদ্বৃত্ত তহবিল থেকে, অর্থাৎ সহজার্থে 'আপৎকালীন' প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ নিজস্ব তহবিলে রাখার পর যা অতিরিক্ত, এ অর্থ তারই অংশ। এ প্রসঙ্গে এ কথাও স্মর্তব্য, আরবিআই-এর বর্তমান কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত সহসা গ্রহণ করেনি। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে কী পরিমাণ অর্থ আবশ্যিক ভাবে মজুত থাকা প্রয়োজন, তা নির্ধারণ করতেপূর্বতন আরবিআই গভর্নর বিমল জালানের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কেন্দ্রের হাতে অতিরিক্ত অর্থ তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত বস্তুত সেই জালান কমিটির সিদ্ধান্তেরই বাস্তবায়ন। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়িত্বগুলি সুস্পষ্ট। তার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হল দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। সেই কারণেই প্রয়োজন অনুসারে একটি বিশেষ পরিমাণ অর্থ আরবিআই নিজ ভাণ্ডারে সর্বদাই মজুত রাখে। সে পরিমাণটি কত হতে পারে তা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা নির্ধারণ করেন, এবং জালান কমিটিই যে প্রথম এমন একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন তা নয়, এর আগেই অন্য একটি কমিটির প্রস্তাবানুসারে এই মজুত অর্থের পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে। এই পরিমাণটি নির্ধারিত হওয়ার পর এবং তা মজুত রাখার পরেই অতিরিক্তের প্রশ্নটি উঠতে পারে। কাজেই এই মজুত অর্থের পরিমাণকে কেন্দ্র করে বিতর্ক অর্থহীন। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সঙ্গে এর তুলনাও অবান্তর, কারণ প্রতিটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সে দেশের নিজস্ব পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজস্ব দায়িত্ব নির্ধারণ করে।

আরবিআই-এর কাছ থেকে কেন্দ্রের ১ লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি টাকা প্রাপ্তির ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর অর্থনৈতিক মন্দাজনিত আর্থিক চাপ নিঃসন্দেহে কিয়দংশে হ্রাস পাবে। আবার এই চাপ কমার ফলে আয়কর বিভাগের উপর থেকেও অবাস্তব লক্ষ্য পূরণের চাপ বহুলাংশে লাঘব হবে। কিন্তু এ সবের কোনও কিছুই একটি মৌলিক সত্যে কোনও রদবদল আনতে পারে না, তা হল, বিগত কয়েক বছরে ভারতীয় অর্থনীতি দুর্বল হয়েছে। পূর্ণ উদ্যমে নতুন এক দফা অর্থনৈতিক সংস্কার বাস্তবায়িত করেই একমাত্র এই মৌলিক সমস্যাটির সমাধান সম্ভব। সমগ্র দেশ তারই অপেক্ষায় রয়েছে।

ধ্বজা

কয়েক দিন হল দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার, কৃষ্ণাঙ্গদের নিষ্পেষণের প্রতীক, পূর্বতন বর্ণবিদ্বেষী রাষ্ট্রের জাতীয় পতাকাটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তার পরেও সে ধ্বজাধারীদের দৌরাত্ম্য কমেছে এমনটা নয়, ওই পতাকা আস্ফালনও কমেনি বিশেষ কয়েকটি মহলে। দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যায় ক্ষুদ্র শ্বেতাঙ্গ নাগরিকগণ ধনী এবং সেই জন্যেই রাজনৈতিক কারণে ক্ষমতাশালী মানুষদের অন্যতম, আর, হয়তো সেই কারণেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর কৃষ্ণাঙ্গদের সমানাধিকার প্রদান নিয়ে তাদের বিরক্তি প্রকাশ এখনও চলছে নানা কায়দায়, নাগালের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে,

৩৭০ ধারা রদের আসল কারণ জাতীয় নিরাপত্তা এবং রাষ্ট্রের চোখে সেই ক্ষেত্রে মূল চ্যালেঞ্জ কাশ্মীরি যুবক

ভয়ই তবে এখন জনগণমন জয়ের হাতিয়ার?

ভারত ক্রমেই একটি সামরিক গণতন্ত্র হয়ে উঠছে, যেখানে দারিদ্র বা বেকারির পরিবর্তে নিরাপত্তাকেই মূল সমস্যা হিসেবে দেখানো হবে। লিখছেন **মইদুল ইসলাম**

রয়টার্স

সাম্প্রতিক অতীতে বিজেপি-র নির্বাচনী কৌশল থেকে পরিষ্কার যে দলিত এবং শূদ্র (মূলত অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি) সম্প্রদায়ের মধ্যে 'হিন্দু পরিচিতি'র নামে হিন্দু-মুসলমান বিভাজনের চেষ্টা নির্বাচনে ফায়দা দিয়েছে। বিজেপি এক তাৎপর্যপূর্ণ অংশের অনগ্রসর শ্রেণির মানুষকে বোঝাতে সক্ষম যে উচ্চবর্ণের তুলনায় ভারতের মুসলমান আসলে তাদের বড় প্রতিপক্ষ। তার সঙ্গে আরএসএস-এর মাধ্যমে বহু বছর ধরে চলতে থাকা একটি কল্পিত মুসলিম তুষ্টিকরণের গল্প। যার সারমর্ম হল মুসলিমদের ব্যাপারে সদা সন্দিহান থাকতে হবে কারণ তাদের পুণ্যভূমি ভারতে নয় এবং তাই তাদের দেশভক্তি ঠনকো অথবা তারা দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, সন্ত্রাসবাদে মদত জোগায় এবং তাই তারা দেশের দুশমন। এই আখ্যানের সঙ্গে বাস্তবের মিল নেই কারণ আর্থ-সামাজিক দিক থেকে ভারতীয় মুসলিমরা বেশ পিছিয়ে। জাতীয় স্তরে বিভিন্ন পরিসংখ্যান অনুযায়ী বহু ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক মাপকাঠিতে মুসলমানরা এমনকী দলিতদের তুলনায়ও পিছিয়ে। গত ছ'সাত দশকে যদি বিভিন্ন সরকার মুসলিমদের তোষণ করত তা হলে আর্থ-সামাজিক ভাবে ভারতীয় মুসলিমরা অনগ্রসর থাকত না। অন্য দিকে মুসলিমদের মধ্যে একটি বড় অংশ আধুনিক ভারত গড়ার ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছে তা অন্যান্য সম্প্রদায়ের থেকে কোনও অংশে কম নয়।

আর একটি কল্প-কাহিনি মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রচার করা হয়। মুসলিম জনসংখ্যার লাগামছাড়া বৃদ্ধি নিয়ে। এই গল্প বলে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীতি তৈরি করার প্রক্রিয়া পরিকল্পনামাফিক বহু দিন ধরে চলছে যেখানে মূল প্রচারের বিষয় 'ওরা কিন্তু আমাদের থেকে বেড়ে যাবে আর তার পর আমাদের উপর ছড়ি ঘোরাবে'। এহেন গালগল্প প্রচারে যে সত্যি কথাটা বলা হয় না তা হল গত কয়েক দশক যাবৎ ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে যাবার প্রবণতা। ২০১৫ সালে পিউ রিসার্চ সেন্টারের বিশ্ব জনসংখ্যা নিয়ে একটি গবেষণা পরিষ্কার করে দেখাচ্ছে যে ২০৫০ সাল নাগাদ ভারতে মুসলিমদের জনসংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে ১৮.৪ শতাংশে আর হিন্দু সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা হবে ৭৬.৭ শতাংশ। কিন্তু দশকের পর দশক চলতে থাকা একটি মিথ্যা আখ্যানকে যদি প্রতিনিয়ত পাল্টা উপাখ্যান দিয়ে মোকাবিলা করা না হয় তা হলে জনমানসের কিছু অংশ একটি নির্মিত আখ্যানকে সত্য বলে গ্রহণ করতে পারে। আর তা আদতে একটি বিশ্বাস বা উত্তর-সত্য। কোনও বৈজ্ঞানিক গবেষণা বা পরিসংখ্যান দিয়ে সেই বিশ্বাসকে টলাতে পারা মুশকিল। গত লোকসভা ভোটে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের যে ছাপ, তা কিন্তু হঠাৎ হয়নি। তা বহু দশক ধরে আরএসএস-এর প্রচার প্রক্রিয়ার ফলাফল।

কিন্তু আরএসএস ছাড়াও গত তিন দশকে আর একটি সমান্তরাল প্রচার চলছে যার সবথেকে বড় মাধ্যম হিন্দি সিনেমা। ৯০-এর দশকের গোড়া থেকে হিন্দি সিনেমার একটা প্রবণতা সন্ত্রাসবাদ-কেন্দ্রিক ছবি। সেই ধরনের ছবির প্রসার এবং প্রভাব বৃহত্তর জনমানসের মধ্যে গিয়ে পড়ে। 'রোজা'র (১৯৯২) মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই কাশ্মীরি জঙ্গি ভারত রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে সংকটাপন্ন করছে। তার পরে পর পর এমন কিছু হিন্দি ছবি তৈরি হয় যেখানে জঙ্গিরা প্রধানত মুসলমান। অনেক ক্ষেত্রে তারা ভারতীয় মুসলিম অথবা তারা পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গি। এ ছাড়া আরও অসংখ্য ছবি যেখানে মুসলিমরা গুন্ডা-মস্তান বা মাফিয়া ডন। আর মুসলিমদের অন্য ভারতীয়দের থেকে আলাদা করার জন্য হয় তাদের দাড়ি থাকতে হবে অথবা টুপি পরিয়ে রাখতে হবে।

এহেন বাঁধাধরা ছকের মধ্যে চলতে থাকা হিন্দি সিনেমার গত তিন দশকের চেহারা দেখলে মনে হয় উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জঙ্গি নেই, শ্রীলঙ্কায় তামিল জঙ্গি নেই বা মাওবাদী বলে ভারতে কিছু নেই যাদের সম্পর্কে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার সব থেকে বড় সংকট। ভারতের দুই প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী কোনও মানুষের জন্য হয়নি। জাতির পিতা, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে কোনও মুসলিম ব্যক্তি হত্যা করেনি। সন্ত্রাসবাদের কোনও ধর্ম হয় না, এই সব কথা আমরা সামাজিক মাধ্যমে প্রায়ই দেখতে ও শুনতে পাই। কিন্তু হিন্দি সিনেমায় 'মুসলিম' আর 'জঙ্গি'কে আলাদা করে দেখানোর ক্ষেত্রে বেশ অরুচি। পাঞ্জাব বা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সন্ত্রাসবাদ, তামিল ইলমের জঙ্গি বা মাওবাদী নিয়ে এখনও হিন্দি ভাষায় হাতে-গোনা ছবি, ঠিক যেমন মুসলিম সমাজের আর্থ-সামাজিক সমস্যা বা সংখ্যালঘু মানুষের প্রান্তিকতা নিয়েও। সন্ত্রাসবাদের উপরে হিন্দি ছবিগুলো দেখলে মনে হবে যে দেশে সন্ত্রাসবাদ ছাড়া আর কোনও সমস্যা নেই। দারিদ্র, বৈষম্য, বেকারত্ব, পরিবেশ দূষণ, সাম্প্রদায়িক হিংসা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সমস্যা? নেই। দেশের প্রধান সমস্যা হল নিরাপত্তা-কেন্দ্রিক। দেশের নিরাপত্তা আসলে সংকটে পড়ে দেশের ভিতরে এবং বাইরের শত্রুদের দ্বারা। তাই সেই শত্রু চিহ্নিত করে দুশমন খতম করলেই দেশে সুদিন আসবে।

এবার আসা যাক সমকালীন রাজনীতির একটা প্রক্রিয়ায়। সেই প্রক্রিয়া হল বেকারত্ব, মজুরি, আর্থিক বৈষম্য, দারিদ্র, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের তুলনায় অভিবাসী ও বিদেশি খেদাও

> সন্ত্রাসবাদের উপরে হিন্দি ছবিগুলো দেখলে মনে হবে যে দেশে সন্ত্রাসবাদ ছাড়া আর কোনও সমস্যা নেই। দেশের প্রধান সমস্যা হল নিরাপত্তা-কেন্দ্রিক। নিরাপত্তা সংকটে পড়ে দেশের ভিতরে এবং বাইরের শত্রুদের দ্বারা। তাই সেই শত্রু চিহ্নিত করে খতম করলেই দেশে সুদিন আসবে।

গোছের কিছু দাবি রাজনীতির ময়দানে জনপ্রিয় হওয়ার প্রবণতা। এক বিশ্ববিখ্যাত রাজনৈতিক তাত্ত্বিকের মতে দক্ষিণপন্থী জনমোহিনী রাজনীতির ভিত্তি হল 'ভয়'। এই ভয় অভিবাসন কেন্দ্রিক বিদেশাতঙ্ক। গত কয়েক বছর ইউরোপ ও আমেরিকাতে বিদেশিদের সম্বন্ধে অহেতুক ভয়কে অস্ত্র করে দক্ষিণপন্থার উত্থান ঘটেছে বেশ কয়েকটি দেশে। তাই দক্ষিণপন্থী জনমোহিনী রাজনীতির প্রধান দাবি 'অভিবাসী ও বিদেশি তাড়াও'। দক্ষিণপন্থী লোকবাদ অভিবাসী সম্পর্কে নানা রকম সন্দেহ ও ভয়ের বাতাবরণ তৈরির রাজনীতি করে। দক্ষিণপন্থী জনমোহিনী রাজনীতির কারবারিরা তাই জনমানসে অভিবাসী সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের গুজব ছড়ায় আর মনে করে যে অভিবাসীরা আসলে দেশজ জনগণের পরিচিতি সত্তার দ্রুত অবলুপ্তির কারণ হতে পারে। এ ছাড়া তারা মনে করে যে অভিবাসীরা দেশীয় শ্রমিকের কর্মসংস্থান কেড়ে নেয়। তাই তাদের দেশ থেকে তাড়ানো দরকার। অন্য দিকে বহুসংস্কৃতিবাদকে দেশজ জনগণের উপর উদারবাদী অভিজাতদের চাপিয়ে দেওয়া নীতি বলে মনে করে তারা। আমাদের দেশে নাগরিকপঞ্জি ও নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের মধ্যে এই দক্ষিণপন্থী লোকবাদী রাজনীতির রেশ প্রবল যেখানে নাগরিকপঞ্জি প্রধানত একটি ভাষাগত জাতিকে 'বিদেশি' বলার প্রক্রিয়াকে দৃঢ় করে তাদের তাড়াবার তাল করছে আর নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের মধ্যে দিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব নির্ণয়ের প্রচেষ্টা চলছে।

কিন্তু আমাদের দেশের সাম্প্রতিক কালের দক্ষিণপন্থী লোকবাদী রাজনীতির সঙ্গে বর্তমান ইউরোপ ও আমেরিকার দক্ষিণপন্থী লোকবাদী রাজনীতির দুটো মৌলিক ফারাক আছে। প্রথমত, সমকালীন ইউরোপ ও আমেরিকার দক্ষিণপন্থী লোকবাদের পিছনে সাম্প্রদায়িক-ফ্যাসিস্ট ধাঁচের শক্তি দশকের পর দশক রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সমর্থন জোগায়নি যা আমাদের দেশে আরএসএস করে চলেছে। দ্বিতীয়ত, অভিবাসী নয়, আমাদের দেশে একটি মাত্র সংখ্যালঘুদের চিহ্নিত করে তাদের দেশের বাইরে পাঠাবার অদম্য ইচ্ছে। অর্থাৎ মুসলিমদের সম্পর্কে প্রচার চালিয়ে তাদের দেশের শত্রু বানাবার যে প্রক্রিয়া চলল, তার সঙ্গে নতুন এক নিরাপত্তা-রাষ্ট্রের অ্যাজেন্ডা খাপ খায়। তাই তো মুসলিম নামধারী ভারতীয় সেনাকর্মীর নামও আসামের নাগরিকপঞ্জিতে ঠাঁই পায় না। কারণ নামের সঙ্গে ধর্মীয় পরিচয় জড়িয়ে থাকে আর সেই সম্পর্কে পূর্ব ধারণা, বিদ্বেষ এবং অন্ধ বিশ্বাসের ভূমিকা থাকে নাগরিক চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়ার মধ্যে যেখানে অনেক সময় পূর্বনির্ধারিত বিশ্বাস থেকে ঠিক করা হয় কে বা কারা দেশের 'আসল' নাগরিক আর কে বা কারা বিদেশি। আর যারা যারা 'আসল নাগরিক' নয় তারা প্রত্যেকেই এই নিরাপত্তা-রাষ্ট্রের ক্ষতিসাধন করতে পারে।

ভারত সরকারের এই বিশ্বাসের জায়গা থেকেই আজকে কাশ্মীরের পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করা যায় যেখানে নিজের দেশের মধ্যেই কাশ্মীর একটা সামরিক দখলদারিতে পরিণত হয়েছে গত তিন দশক ধরে। ৩৭০ ধারা বিলোপের পরে সেই সামরিক দখলদারি আরও জোরদার হয়েছে। একটি রাজ্য ভাঙা বা সীমানা পরিবর্তনের জন্য আমাদের দেশের সংবিধানের ৩ নম্বর ধারায় পরিষ্কার বলা আছে সেই রাজ্যের বিধানসভায় যাতে ওই সংক্রান্ত বিল নিয়ে চর্চা হয়। জম্মু ও কাশ্মীরে এখন রাষ্ট্রপতি শাসন। কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীরের পরের বিধানসভা ভোট পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে না। কারণ নিরাপত্তা-রাষ্ট্রের বিবেচনায় কাশ্মীর হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। কাশ্মীরকে ঘিরে এক দিকে পাকিস্তান আর অন্য দিকে চিন, দেশের নিরাপত্তার কাছে বড় মাথাব্যথা। কাশ্মীরের দলগুলোকে এই নিরাপত্তা-রাষ্ট্র বিশেষ ভরসা করে না। তাই ৩৭০ ধারা অবিলম্বে বিলোপ করতে হবে। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে। যে সব কারণগুলো সরকারি ভাবে বলা হচ্ছে (যথা অকাশ্মীরিরা কাশ্মীরে জমি কিনতে পারবে, কাশ্মীরি মহিলারা অকাশ্মীরি বিয়ে করলেও সম্পত্তির অধিকার পাবে ইত্যাদি) সেগুলি গৌণ। কারণ বাইরের রাজ্যের মানুষ তো হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অনেক রাজ্যে জমি কিনতে পারে না। এক দেশ এক আইন হবার জয়ধ্বনি দিতে গেলে ভারতীয় সংবিধানের ৩৭১ ধারার অন্তর্গত যে সমস্ত রাজ্যের জন্য 'অস্থায়ী', 'পরিবর্তনকালীন' এবং 'বিশেষ' ব্যবস্থা আছে তারও তো অবসান ঘটাতে হয়। তাই কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপের মুখ্য কারণ হল নিরাপত্তাজনিত এবং রাষ্ট্রের চোখে সেই জাতীয় নিরাপত্তার প্রধান চ্যালেঞ্জ হল কাশ্মীরের মুসলিম যুবক যে এত দিন হিন্দি সিনেমার চিরাচরিত জঙ্গি এবং ভিলেন।

ভারত ক্রমশ একটি সামরিক গণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলেছে। দেশে প্রত্যেক পাঁচ বছর অন্তর হয়তো নির্বাচন হবে কারণ শাসনক্ষমতাকে একটা গণতান্ত্রিক বৈধতার জামা পরাতে হবে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ ও বিদেশনীতির ক্ষেত্রে ক্রমশ সামরিক বিষয়গুলো প্রাধান্য পাবার প্রবণতা আরও জোরদার হবার সম্ভাবনা।

লেখক সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, কলকাতায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক